পিঠা পুলির আখ্যান

ঋষিকা

হাঁড়িতে পানি গরম হচ্ছে। হাঁড়ির মুখে বসানো ঢাকনার ফুটো দিয়ে বের হচ্ছে জলীয় বাষ্পের গরম ভাপ। একটা মাটির ছোট বাটিতে পাতলা কাপড় নিয়ে তাতে প্রথমে ভেজা চালের আটা দিয়ে তার উপরে গুড়ের প্রলেপ, এরপর নারকেল কোরা। তার উপরে আবার ভেজা চালের আটা। এবার বাটিটি উল্টে দেওয়া হলো জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসা হাঁড়ির ঢাকনার উপরে। সেটা ঢেকে দেওয়া হলো আরও একটি ঢাকনা দিয়ে। এবার ৫ থেকে ৬ মিনিট অপেক্ষা। ঢাকনা খুললেই ধোঁয়ার সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা মিষ্টি ঘ্রাণ। যে খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা করা হলো তার নাম ভাপা পিঠা। কি? মনে হচ্ছে না, শীত জেঁকে বসেছে? এমন হাজারও পিঠা আছে যেগুলো শীতকালকে মধুর করে তোলে।

ষড়ঋতুর এই দেশে প্রতিটি ঋতুরই নিজস্ব রঙ আর গন্ধ আছে। শীতের বাতাসেই থাকে পিঠার গন্ধ। শীতকাল এলেই বড়রা চলে যান তাদের স্মৃতির শীতে। যেখানে ছিল শীতের ছুটির আনন্দ। নানাবাড়ি, দাদাবাড়ির কুয়াশা ভেজা মাঠ। সকালে উঠে মা, দাদি কিংবা মামি-চাচির হাতের পিঠা, ভেজা আটার গন্ধ, তালের রস, খেজুরের গুড়, আরও কত কি। নগরায়নের ফলে শহরকেন্দ্রিক শিশুরা শীতের ছুটিতে খুব একটা গ্রামে যেতে পারে না। তাদের বাবা-মায়েদের শেষ ভরসা পিঠা মেলা। সেখানে পিঠার স্বাদ পেলেও জানা যায় না পিঠার আসল ইতিহাস।

পিঠা কেন পিঠা হলো

'পিঠা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পিষ্টক' শব্দ থেকে। আবার পিষ্টক এসেছে 'পিষ্' ক্রিয়ামূলে তৈরি হওয়া শব্দ 'পিষ্ট' থেকে। পিষ্ট অর্থ চূর্ণিত, মর্দিত, দলিত। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষে লিখেছেন, 'পিঠা হলো চাল গুঁড়া, ডাল বাটা, গুড়, নারিকেল ইত্যাদির মিশ্রণে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ।' ধান থেকে চাল এবং সেই চালের গুঁড়া, পিঠা তৈরির মূল উপাদান। পিঠার আলোচনায় 'পুলি পিঠা' বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পুলি পিঠা হচ্ছে একমাত্র পিঠা, যাতে বিভিন্ন উপাদানের পুর দেওয়া হয়। পুলি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পোলিকা' থেকে। প্রাচীন মতে, পোলিকা হলো ভারী রুটি। এদিকে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষে জানাচ্ছেন, 'পুলি/পুলী হচ্ছে নারকেলের পুর দেওয়া খাদ্যবিশেষ।' আমরা 'পিঠাপুলি' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করি মূলত পুর ছাড়া এবং পুর দেওয়া পিঠাকে একসাথে বোঝাতে। মিষ্টি মণ্ডার চাইতে প্রাচীন বাংলায় মিষ্টান্ন হিসেবে পিঠার জনপ্রিয়তা ছিল বেশি। বাংলাভাষায় লেখা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি কাব্য এবং ময়মনসিংহ গীতিকার কাজল রেখা'য় আনুমানিক গত পাঁচশ বছর সময়কালে বাঙালি খাদ্যসংস্কৃতিতে পিঠার জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কেন শীতেই পিঠার আয়োজন

গ্রামীণ পরিসরে সারা বছর পিঠা খাওয়ার প্রচলন নেই। সেখানে শীতই হচ্ছে পিঠা বানানোর আদর্শ সময়। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধান উঠার পর গোলাবন্দি করতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। নবান্নর পর শীত পড়লে পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠা তৈরির আয়োজন করা হয়। বসন্তের আগমন পর্যন্ত চলে হরেক পদের পিঠা খাওয়া। মূলত মাঘ আর ফাল্গুন এই দুই মাস পিঠা খাওয়া হয়। নতুন ধান থেকে তৈরি চালে যে সুঘ্রাণ আর আর্দ্রতা থাকে, পিঠা বানানোর আটা তৈরিতে সেই চাল আদর্শ। ধান যত পুরাতন হতে থাকে ততই সে আর্দ্রতা হারাতে থাকে। ফলে সেই চালের আটায় তৈরি পিঠা আর সুস্বাদু থাকে না আগের মতো। হেমন্তে নতুন ধান উঠে গেলে নারীরা ঢেঁকিতে পিঠার জন্য চালের আটা বানাতো। যদিও এখন আর ঢেঁকির প্রচলন নেই। এখন 'কল' থেকে আটা তৈরি করে আনা হয়।

ভাপা পিঠা

শহরে শীতের আমেজ বোঝা যায় অলিগলির ভাপা পিঠার দোকান দেখে। ভাপা পিঠা বাংলাদেশ ও ভারতের একটি ঐতিহ্যবাহী পিঠা। কোথাও কোথাও ধুপি পিঠা বা ধুকি পিঠা নামে পরিচিত। বাষ্পে সিদ্ধ করা হয় বলে এই পিঠার নাম ভাপা পিঠা। চালের গুঁড়া দিয়ে জলীয় বাষ্পের আঁচে তৈরি করা হয় এই পিঠা। মিষ্টি করার জন্য গুড় আর স্বাদ বৃদ্ধির জন্য নারকেলের শাঁস দেওয়া হয়। এটি গ্রামীণ পিঠা হলেও বিশ শতকের শেষভাগে শহুরে মানুষের খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছে। এর ধরনের মধ্যে রয়েছে মিষ্টি ও ঝাল ভাপা। ভাপা পিঠা মোগল আমলে ঢাকার অন্যতম পিঠা ছিল। তখন পিঠায় দেওয়া হতো ঘি, জাফরান, মালাই, খিরসা, পেস্তা বাদাম, মোরব্বা আর যশোরের খেজুরের গুড়, সুগন্ধি চাল। এই পিঠাগুলো আকারে বড়। তাই বলা হতো শাহি ভাপা পিঠা।

চিতই পিঠা

চিতই পিঠার ব্যাপকতা দেখা যায় শহরের অলিগলিতে। শীতকালে তো বটেই বছরের অন্যান্য সময় এই পিঠা তৈরি হয়। অনেক রকম ভর্তা দিয়ে এই পিঠা খাওয়া হয়। আবার মাংসের ঝোল, কলিজা ভুনা, হাঁস ভুনার সাথেও দিব্যি চলে চিতই পিঠা। গ্রামাঞ্চলে চিতই পিঠা তৈরির

ছাঁচ পাওয়া যায়। অঞ্চলভেদে এই ছাঁচও হয় নানারকম। কোথাও মাটির আবার কোথাও লোহার তৈরি ছাঁচে তিন পিঠা, পাঁচ পিঠা, সাত পিঠা পর্যন্ত করা যায়। এই ছাঁচগুলোতে বিভিন্ন আকৃতির যেমন গোল, ডিম্বাকৃতি, অর্ধচন্দ্রাকৃতি, হৃদয়াকৃতি পিঠা বানানো যায়। পিঠার গোলা গরম ছাঁচে পরিমাণ মতো ঢেলে ঢাকনি দিয়ে ছাঁচটি ঢেকে দিতে হয় যেন গরম বাষ্প বের হতে না পারে। কয়েক মিনিট পর পিঠাটি খুন্তি বা অন্য কিছুর সাহায্যে তুলে নিতে হয়। ছিদ্রযুক্ত এই পিঠা দেখতে অনেকটা প্যানকেকের মতো। কথিত আছে, একবার এক ইংরেজ এই চিতই পিঠা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, পিঠার ভিতর এত ছিদ্র কীভাবে করা হলো! চিতই পিঠা খেজুরের রস বা খেজুরের রসযুক্ত দুধে ভিজিয়ে তৈরি হয় দুধ চিতই বা ভিজা পিঠা। দুধ চিতই মূলত পৌষপার্বণ ও নবান্ন উৎসবের পিঠা। নতুন চাল কুটে পিঠা বানিয়ে খেজুরের রসে সারা রাত ভিজিয়ে ভোরে এই পিঠা না খেলে শীতকালটা ঠিক জমে না।

চন্দ্রপুলি পিঠা

নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণে বেহুলার বিয়ে উপলক্ষ্যে পরিবেশিত মিষ্টান্নের মধ্যে চন্দ্রপুলি পিঠার কথা উল্লেখ আছে। এ পিঠা আকারে অর্ধচন্দ্রাকৃতি; তাই এর নাম চন্দ্রপুলি রাখা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পৌষ পার্বণে এই পিঠা বেশি প্রস্তুত করা হয়। ঈদ, পূজা-পার্বণ ও বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে এই পিঠা তৈরির রেওয়াজ আছে। চালের গুঁড়ায় তৈরি পিঠার কাইয়ের ভেতরে নারকেল, দুধ ও চিনি বা গুড়ের মিশ্রণের পুর থাকে। শুকনা কিংবা দুধ বা রসে ভেজানো এ পিঠা খেতে সকলের ভালো লাগে। খুলনার দিকে এই পিঠার উৎপত্তি বলে মনে করেন অনেকেই।

বিবিখান পিঠা

চলিত তথ্য অনুযায়ী, রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় থেকে এই পিঠা চালু আছে। শুরুতে ফরিদপুর, শরীয়তপুর এবং ঢাকার বিক্রমপুর ও আশেপাশের অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে এই পিঠা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন গ্রামবাংলায় নবান্ন উৎসবের আয়োজনে তৈরি বিভিন্ন পিঠার মধ্যে বিবিখানা অন্যতম। শরীয়তপুরে গ্রামাঞ্চলে এই পিঠাকে 'জামাই ভুলানো পিঠা' বলা হয়। সাধারণত পিঠা বাড়ির কনে-বউরাই তৈরি করে। কনে বা বউদের গ্রামের ভাষায় বিবিও বলা হয়। সেখান থেকেই এই পিঠার নাম হয় বিবিখানা পিঠা। আবার এই মজার পিঠা খাইয়েই নাকি বিবিরা তাদের স্বামীদের বশ করে ফেলেন। তাই বলা হয় জামাই ভুলানো পিঠা। আবার অনেকে বলেন, পুরানো আমলে কোনো এক ধনীর গিন্নি মানে বিবির জন্য প্রথম তৈরি করা হয়েছিল এই পিঠা; সেই থেকে বিবিরা এই পিঠা খেতে পছন্দ করতেন বলে এর নাম হয় বিবিখানা পিঠা।

খোলাজা পিঠা

নোয়াখালীর জনপ্রিয় পিঠা খোলাজা পিঠা। চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি হয় খোলাজালি বা খোলাজা পিঠা। মাংস দিয়ে এ পিঠা খাওয়া হয়। তবে হাঁসের মাংস দিয়ে খেতেই বেশি মজা।

নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহি পিঠার মধ্যে অন্যতম আরও কিছু পিঠা হলো ম্যাড়া পিঠা, নারিকেল পুলি পিঠা, ডিমের পানতোয়া, নারিকেলের চিড়া।

হাত সেমাই পিঠা

খুলনা, বাগেরহাট অঞ্চলের মানুষের প্রিয় হাত সেমাই পিঠা। এ পিঠা ভাপে সেদ্ধ করে হাঁস ভুনা দিয়ে খাওয়া হয়। একে সই কিংবা চুষি পিঠাও বলা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা সেমাই পিঠা তৈরিতে পারদর্শী। খেজুরের গুড়, দুধ ও নারকেল দিয়ে রান্না করা হয় এটি। গ্রামাঞ্চলে কড়া রোদে শুকিয়ে পিঠা বয়ামে রেখে সংরক্ষণও করার চল আছে।

নকশি পিঠা

নকশি পিঠা, পাক্কান পিঠা, ফুল পিঠা ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে বেশি তৈরি হয়। চালের খামির বানিয়ে মোটা করে বেলে তার ওপরে খেজুর কাঁটা দিয়ে একটু গভীর করে আলপনা আঁকা হয়। পাক্কন বা মুগপাক্কনও সুঁই কাটা দিয়ে নকশা করা পিঠা। তবে এর গোলাতে মুগ ডাল লাগে। নকশি পিঠা একরকম লোকশিল্প। পিঠার গায়ে যখন বিভিন্ন ধরনের নকশা আঁকা হয় অথবা ছাঁচে ফেলে পিঠাকে চিত্রিত করা হয় তখন তাকে বলা হয় নকশি পিঠা। নকশার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পিঠার বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। যেমন শঙ্খলতা, কাজললতা, চিরল বা চিরনপাতা, হিজলপাতা, সজনেপাতা, উড়িয়াফুল, বেঁট বা ভ্যাট ফুল, পদ্মদীঘি, সাগরদীঘি, সরপুস, চম্পাবরণ, কন্যামুখ, জামাইমুখ, জামাইমুচড়া, সতীনমুচড়া প্রভৃতি। নকশি পিঠার উৎপত্তি কখন কিভাবে হয়েছিল তার কোনো প্রমাণসিদ্ধ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলেও নকশি পিঠা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এই নকশি পিঠা কালের বিবর্তনে গ্রামবাংলার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

রুট পিঠা

জামালপুর ও টাংগাইল অঞ্চল থেকে এসেছে রুট পিঠা। এটি রান্না করা মাংস, চালের গুঁড়া, পেঁয়াজ, মরিচ সব মিশিয়ে তৈরি হয়। মাটির কলসিতে মিশ্রণটি ঢেলে চুলার আগুনে পুড়িয়ে তৈরি হয় বিচিত্র পিঠাটি। সুনামগঞ্জে পিঠা তৈরির জন্য আগের দিন সন্ধ্যা থেকে বাড়িতে চাল ভিজিয়ে রাখা হতো, তারপর সেই চাল ঢেঁকিতে কুটে গুঁড়া করে কাই মাখানো হয়, পরে ওই কাইয়ের সাথে পিঁয়াজ, হলুদ, আদা ইত্যাদি মসলা সামগ্রী মিশিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট আকৃতির চ্যাপ্টা গোলাকার পিঠা বানানো হয়। একেকটি পিঠা ভাত খাওয়ার থালার আকৃতির হয়। ওই পিঠার উভয় পিঠে তেল মাখিয়ে তা কলাপাতা দিয়ে মোড়ানো হয়।

চুঙ্গাপুড়া পিঠা

সিলেটের গ্রামাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী খাবার চুঙ্গাপুড়া পিঠা। চুঙ্গাপিঠা তৈরির প্রধান উপকরণ ঢলু বাঁশ ও বিন্নি (বিরইন) ধানের ধানের চাল, দুধ, চিনি, নারিকেল, ঢলু বাঁশ ও চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি। বাঁশের মধ্যে কলাপাতা দিয়ে তার মধ্যে ভেজানো বিন্নি চাল ভরে খড় দিয়ে মুখ আটকে চুলায় পোড়াতে হয়। বড় মাছ যেমন রুই, কাতলা, চিতল, বোয়াল, পাবদা, কই, মাগুর মাছ হাল্কা মসলা দিয়ে ভেজে চুঙ্গাপুড়া পিঠা দিয়ে খাওয়াই ছিল সিলেট অঞ্চলের একটি অন্যতম ঐতিহ্য। বাড়িতে মেহমান বা নতুন জামাইকে শেষ পাতে চুঙ্গাপুড়া পিঠা, মাছ বিরান আর নারিকেলের ও কুমড়ার মিঠা বা রিসা পরিবেশন করা হতো। সিলেটের পাহাড়ি আদিবাসীরা বাঁশ কেটে চুঙ্গা বানিয়ে এর ভেতর ভেজা চাল ভরে তৈরি করতো এক ধরনের খাবার। ধীরে ধীরে এ খাবার পাহাড়িদের কাছ থেকে সিলেটবাসীদের কাছে চলে আসে। সময়ের পরিক্রমায় চুঙ্গা দিয়ে তৈরি করা এই খাবার এখন চুঙ্গা পিঠা নামে বহুল পরিচিত। সিলেটের আরেকটি জনপ্রিয় পিঠা নোনতা বা নুনগড়া পিঠা।

তেলের পিঠা

ঢাকার বিয়েতে থাউকা বড়া নামের একটি পিঠা থাকে। এটি অঞ্চলভেদে পুয়া, মালপোয়া, ভাজা পিঠা, তেলের পিঠা ইত্যাদি নামে পরিচিত।

আরও কিছু পিঠা

সব অঞ্চলের পিঠাতেই স্থানীয় লোকঐতিহ্য আছে। যেসব পিঠা মোগল আমল থেকে এই বাংলায় রাজত্ব করে যাচ্ছে সেগুলো হলো: পাটিসাপটা, গুজা, ডালরুটি, ছিট, ছানার মালপোয়া, দুধ পুলি। এ ছাড়া ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের অঞ্চল যেমন নবাবগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁ এলাকায় ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য পিঠার মধ্যে মুখশল, চাপড়ি, গুলগুলা, খেজুর, ডিমের ঝাল পোয়া, ঝাল পাটিসাপটা, বিবিখানা, কলা, তিল পুলি, সাবুর, ম্যারা, লবঙ্গ লতিকা, মুঠি, ছিটরুটি ও জামাই পিঠা উল্লেখযোগ্য। নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চলের পিঠা হলো খোলাজা, ম্যাড়া, ডিমের বিস্কুট, নারকেল পুলি, গোলাপ, ডিমের পানতোয়া, ঝাল পানতোয়া, ঝুনঝুনি ও নারকেলের চিড়া। চট্টগ্রামের ঐতিহ্য হলো বিন্নি ভাত বা মধু ভাত। সেখানে কলা, নারকেল, বিন্নি চাল, চিনি দিয়ে কলাপাতায় মুড়ে ভাপে পিঠা তৈরি করা হয়। স্থানীয় ভাষায় এ পিঠার নাম আতিক্কা। আবার বিন্নি চালের গুঁড়ার সঙ্গে নারকেল, গুড় দিয়ে তৈরি হয় বিন্নি পুলি, যা স্থানীয় ভাষায় পরিচিত হাফাইন্না পিঠা বা গোইজ্জা পিঠা নামে।